গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস

আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় ইতিহাসবিদ হিসাবে। মুর্শিদাবাদের সন্তান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত মহেঞ্জোদারো সভ্যতার আবিষ্কারক হিসাবে। কিন্তু তাঁর এই পরিচয়ের বাইরেও আরও একটি পরিচয় আছে যার খবর আমরা অনেকেই রাখিনা। শিল্পকলা নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বেশকিছু লেখার মধ্যে দিয়ে। এটি তারই মধ্যে একটি।

আমাদের দেশে শিল্পের ইতিহাসের চর্চা অনেক দিন পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এম-এ, ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ অনেকেই আমাদের বাঙ্গালা দেশের পুরাতন শিল্প-গৌরবের চর্চা করিয়াছেন। অনেক দিন ধরিয়া মালমশলা সংগ্রহ হইবার পরে এখন গৌড়-দেশের প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস সংকলন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। গৌড়-দেশ বলিলে পূর্বে কেবল উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে বুঝাইত, কিন্তু খ্রিষ্টের জন্মের আটশত নয়শত বৎসর পর হইতে মগধ, অঙ্গ, তীরভূক্তি, মিথিলা, রাঢ়, বরেন্দ্র, বকদ্বীপ, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি নাম ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে প্রায় মুছিয়া গেল। এই সমস্ত নামগুলি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিত বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোক শোন-তীর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এবং হিমাচলের পাদমূল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশগুলিতে খ্রিষ্টাব্দের দ্বাদশ শতক পর্যন্ত গৌড়দেশ বা গৌড়রাজ্য বলিয়াই জানিত। ইহার কারণ মগধের গুপ্ত বংশের অধঃপতনের পরে পালবংশীয় প্রথম রাজা গোপালদেব কর্তৃক মগধ ও গৌড়ে (উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে) একটি নূতন রাজ্য স্থাপন। প্রথম গোপালের পুত্র ধর্মপালের রাজ্যকালে মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও গৌড়ের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি প্রায় সমস্ত উত্তরাপথব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। খ্রিস্টের জন্মের দুই তিন শতক পূর্বে মগধের রাজারা যেমন উত্তরাপথের পূর্বাংশে জয় করিয়া প্রাচ্য-রাজ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন পাল বংশের রাজারা সেইরূপে খ্রিস্টের অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত গৌড়-রাজ বলিয়া

পরিচিত হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে গৌড় দেশ পাল বংশের রাজাদের হস্তচ্যুত হইলেও তাহাদিগকে অপর দেশের শিলালেখে গৌড়-রাজ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পালবংশের প্রতিষ্ঠার অতি অল্পকাল পরে প্রাচীন প্রাচ্যে শিল্প নবজীবন লাভ করিয়াছিল। গান্ধারে যবন বা গ্রিক রাজগণের সময়ে, মথুরায় শক ও কুশান রাজগণের সময়ে যেমন নূতন শিল্পরীতি জন্মলাভ করিয়াছিল সেইরূপ বৃহত্তর গৌড়দেশে ভাস্করের শিল্প নূতন অবয়ব ধারণ করিয়া "গৌড়ীয় রীতি" আখ্যা লাভ করিয়াছে। শিল্পের এই নূতন রীতি আবিষ্কারের দাবি করিয়াছিলেন সর্বপ্রথমে পুজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। কিন্তু সে সময়ে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত না থাকায় শিল্পের ক্রমবিকাশ ও বিস্তার সম্পূর্ণরূপে অধীত হয় নাই। গৌড়ীয় শিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন পশ্চিমে শ্রাবস্তী ও পূর্বে আসাম পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই নূতন শিল্পরীতি মথুরার শিল্পরীতির ন্যায় গৌড়-দেশ ছাড়াইয়া বহু দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। গৌড়ীয় ভাস্করের মূর্তির কতক বিশেষত্ব আছে, উড়িষ্যার শিল্পের সহিত ইহার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। গৌড়ের ভাস্কর গিয়া নেপালে নূতন শিল্প-রীতি প্রবর্তন এবং তিব্বতে গৌড়ীয় রীতির শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছিল। সুদূর যবদ্বীপেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং উড়িষ্যায় খ্রিস্টাব্দের পঞ্চদশ শতকে সূর্যবংশের নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ওড়িশায় দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় ভাস্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল।

বর্তমান সময়ের খাস বাঙ্গালা দেশ আসামের শ্রীহট্ট ও কামরূপ, সমস্ত দক্ষিণ ও উত্তর বিহার এবং যুক্ত-প্রদেশের গাজিপুর ও গোরখপুর জিলায় যে সমস্ত মূর্তি পাওয়া যায় তাহাদের শিল্পীদের আদর্শের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংকলন করিবার একটি সুন্দর উপায় আছে। বাঙ্গালা ও বিহারের অনেক মূর্তিতে কিছু-না-কিছু লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মূর্তির মধ্যে শতকরা ৯০টি ও হিন্দু মূর্তির মধ্যে শতকরা ৩০টি কোনও-না-কোনও লেখযুক্ত। কোনও মূর্তিতে রাজার নাম, প্রতিষ্ঠাতার নাম ও তারিখ লেখা থাকে, অধিকাংশ বৌদ্ধমূর্তিতে একটি বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত আছে। যে সকল মূর্তিতে রাজার নাম ও তারিখ আছে তাহার তারিখ সহজেই জানিতে পারা যায়। এই সমস্ত মূর্তির শিলালেখের তারিখ কোনও অব্দের তারিখ নহে। এ পর্যন্ত গৌড়দেশে যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র দুই তিনটিতে কোনও অব্দের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলিতে রাজার নাম ও তাহার রাজ্যাঙ্ক দেওয়া থাকে; যেমন "শ্রীদেবপালদেব রাজ্যে সম্বৎ ৩৫"। ইহা হইতে মূর্তিটি খ্রিস্টাব্দের

কোন্ শতকের কোন্ দশকে তৈয়ারি হইয়াছিল তাহা পর্যন্ত বুঝিতে পারা যায়। ধর্মপাল, দেবপাল, নারায়ণপাল, মহীপাল হইতে বাঙ্গালার পালবংশীয় শেষ রাজা মদনপালের অনেক শিলালেখ ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা বর্ণমালার পরিবর্তন ও বর্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার উৎপত্তি জানিতে পারা গিয়াছে। গৌড়রাজ্যে আবিষ্কৃত যে সমস্ত প্রাচীন মূর্তিতে রাজার নাম বা তারিখ লেখা নাই, কেবল দাতার নাম অথবা মন্ত্র উৎকীর্ণ আছে তাহাতে মূর্তি পালবংশের বা সেনবংশের কোন্ রাজার রাজ্যকালে তৈয়ারি হইযাছিল তাহা এখন স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে। কলিকাতা, পাটনা ও ঢাকার চিত্রশালা এবং রাজশাহিতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় যে সমস্ত লেখযুক্ত মূর্তি আছে তাহা তারিখ ধরিয়া সাজাইয়া লইয়া গৌড়ীয় শিল্পরীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ স্থির করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় শিল্পরীতির জন্মের পূর্বে গৌড়রাজ্যে শিল্পের কীরূপ অবস্থা ছিল তাহা সর্বপ্রথমে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। পালবংশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে গৌড়দেশে ঘোরতর অরাজকতা (মাৎস্যন্যায়) উপস্থিত হইলে দেশের লোকে ধনী ও প্রবীণের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল। গৌড়দেশে যখন ঘোর অরাজকতা ছিল তাহার পূর্বে এই দেশে যে রাজা ছিলেন, তাহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল এবং তিনি কোন্ বংশজাত এ-পর্যন্ত তাহার কিছুই জানা যায় নাই। গয়া ও ভাগলপুর জেলায় যে সমস্ত শিলালেখ আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানতে পারা যায় যে, মগধের গুপ্তবংশজাত আদিত্য সেন নামক একজন রাজার রাজত্বকালে ৬৭২ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে ও পরে এই দুইটি জেলা তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে আদিত্য সেনের রাজ্যকালে বিহারে শাহপুর গ্রামে একটি সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মূর্তিটি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু শিলালেখের ছায়া আছে। আদিত্য সেনের বংশধর ২য় জীবিত গুপ্ত আরা জেলায় দেওবনারক গ্রামে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের একটি স্তম্ভে ওই রাজার একটি শিলালেখ আছে। শাহপুর ও দেওবনারকের শিলালেখের অক্ষর দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় খ্রিস্টাব্দে সপ্তম শতকের শেষভাগে ও অষ্টমের প্রথমভাগে উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে অক্ষরের আকার কীরূপ ছিল। এইরূপ আকারের অক্ষর যে সমস্ত মূর্তির লেখে দেখিতে পাওয়া যায় যে মূর্তিগুলি সপ্তম ও অষ্টম শতকের। বুদ্ধগয়া, কুক্কুট বিহার বা কুরকিহার নালন্দা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থে সহস্র বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম শতকের মূর্তি সংখ্যায় অতি অল্প। উদাহরণস্বরূপ এই

সময়ের তিন চারিটি মূর্তির চিত্র প্রকাশিত হইল; এই চিত্র হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খ্রিস্টাব্দের সপ্তম ও অষ্টম শতকে গৌড়রাজ্যে শিল্পের কী ঘোরতর দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। খ্রিস্টাব্দের সপ্তম শতকের শেষভাগে ‘‘বলাধিকৃত’’ অর্থাৎ সেনাপতি মল্লুক উদ্দণ্ডপুর নগরে (পাটনা জেলার বিহার নগর) যে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ভাস্করের অনুপাতের জ্ঞান প্রায় ছিল না। এই যুগে বুদ্ধগয়ায় আর একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এখনও কলিকাতায় আসে নাই। বুদ্ধগয়ায় দশনামি গিরি সম্প্রদায়ের যে মঠ আছে তাহাতে অনেক সুন্দর প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি রাখা আছে। এই মঠের উত্তর দিকের দরওয়াজার পশ্চিমপার্শ্বে একটি ছোটো ঘরে এই মূর্তিটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সময়ে নাগরাজ মুচলিন্দ নিজের দেহ দিয়ে বুদ্ধকে ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই মূর্তিটি সেই ঘটনার চিত্র। এই মূর্তির নীচে একটি বৌদ্ধ মন্ত্র খোদিত আছে, তাহার অক্ষর হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই মূর্তি এবং বলাধিকৃত মল্লুকের মূর্তির বয়স এক। বুদ্ধগয়ার মূর্তিতে মল্লুক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্তির ন্যায় ভাস্করের অনুপাত জ্ঞানের নিতান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পাথরের মূর্তিতে খ্রিস্টাব্দের সপ্তম শতকের শেষে ও অষ্টমের প্রথমে ভাস্করের অনুপাদ-জ্ঞানের অভাব এবং দেবাঙ্গে বৈচিত্র্য বা অঙ্গ-সৌষ্ঠব ফুটাইবার চেষ্টার বিফলতা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় সেইরূপ এই যুগের ধাতু মূর্তিতেও শিল্পের অবনতির প্রচুর প্রমাণ দেখা যায়। এখন যেমন অষ্ট ধাতুর মূর্তি গড়িতে হইলে মাটির মূর্তি গড়িয়া তাহার ছাঁচ তুলিয়া সেই ছাঁচে অষ্ট ধাতু ঢালিতে হয় এবং পরে চাঁছিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করিতে হয় তখনও তাহাই করিতে হইত, কিন্তু গুপ্তবংশীয় সম্রাটদিগের রাজত্বকালে শিল্পীর যে উচ্চ আদর্শ ছিল খ্রিস্টাব্দের সপ্তম ও অষ্টম শতকে তাহার কতদূর অবনতি হইয়াছিল স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাস্করের ন্যায় শিল্পীর সর্বপ্রকার অবনতি হইয়াছিল।

উত্তর ভারতের সমস্ত প্রদেশের ন্যায় বাঙলা দেশে ও গুপ্তযুগে একই আদর্শ প্রচলিত হইয়াছিল। এমনকি বাঙালিরা বারাণসীর ভাস্করের গড়া দেবমূর্তি আনিয়া বাঙলা দেশে নিজেদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতেন। রাজশাহি জেলার বিহারৈল গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চুনারের বেলে পাথরের মূর্তি এবং দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধ কাশী বা সারনাথের শিল্পীর তৈয়ারি। এই মূর্তিটি অবশ্য নিজে গুপ্তযুগের অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের মূর্তি। এই মূর্তি বলাধিকৃত মল্লুকের ও বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্তি হইতে পুরাতন। কিন্তু এই তিনটি তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর আদর্শ হইতে ও অষ্টম শতকে শিল্পীর আদর্শের কতদূর অবনতি হইয়াছিল।

কেমন করিয়া গৌড়রাজ্যে শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইল, কোন্ কারণে নবম শতকে গৌড়ীয় শিল্প হঠাৎ অভূতপূর্ব সৌন্দর্য লাভ করিল তাহা বুঝিতে হইলে অষ্টম শতকে উত্তর

ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। অষ্টম শতকের শেষভাগে পঞ্জাবে হূন ও গুর্জরগণ হিন্দুরাজ্য লোপ করিয়াছিল, রাজপুতানা, মালব ও গুজরাটে হূনেরা ও গুর্জরেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কান্যকুব্জে অর্থাৎ বর্তমান যুক্তপ্রদেশে আয়ুধ উপাধিকারী এক রাজবংশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কেবল ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ এই দুই জন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ এবং সুখ শান্তির অভাবে উত্তর ভারত হইতে সুকুমার শিল্প এরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এ পর্যন্ত সপ্তম ও অষ্টম শতকের মূর্তি বা মন্দির যুক্তপ্রদেশ বাঘেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, মথুরা, দিল্লি, রাজপুতানা, মালব ও গুজরাটে পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও যে খ্রিস্টাব্দের সপ্তম ও অষ্টম শতকের মূর্তি এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের শিল্পের বড় বড় কেন্দ্রে, যেমন পাটলিপুত্রে, বারাণসীতে বা সারনাথ ও মথুরায়, সপ্তম ও অষ্টম শতকে মূর্তি গঠন একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরে মধ্যযুগে অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দের দশম ও একাদশ শতকে শিল্পের যে সমস্ত বিখ্যাত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহাদিগের আরম্ভ গুর্জর জাতীয় প্রতিহার বংশীয় সম্রাটের প্রতিষ্ঠার পরবর্তী। মালবের ধারা, বাঘেলখণ্ডের ত্রিপুরি, বুন্দেলখণ্ডের খর্জুরবাহক, যুক্তপ্রদেশের কান্যকুব্জ এবং দিল্লি ও আগ্রা অঞ্চলের মথুরা খ্রিস্টাব্দের দশম ও একাদশ শতকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সকল শিল্পকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে গৌড়ীয় শিল্পরীতি দেবপাল এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া দেশে যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ফলে গৌড়রাজ্যের কেন্দ্রে নূতন শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

পালবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপালের সমস্ত জীবন যুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল এবং তাহার সময়ে গৌড়ীয় শিল্পের বিশেষ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। সপ্তম শতকের শেষভাগে ও অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে গৌড়রাজ্যের শিল্পের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা যায় বটে, কিন্তু সে পরিবর্তন শিল্পজগতে নবজীবনের পরিচায়ক নহে। তখনও গৌড়রাজ্যের শিল্পী গুপ্তযুগের আদর্শ নকল করিয়াই নিজের কাজ শেষ হইয়াছে মনে করিত, নূতনত্বের প্রয়াস বা চিন্তাশক্তির বিকাশ তাহাদের কার্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়রাজ্যবাসী তখনও বাণিজ্যে অথবা রাজ্য-বিস্তৃতিতে ধনশালী হইয়া উঠে নাই; ভাস্কর, শিল্পী অথবা চিত্রকরকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবার শক্তিও তাহাদের হয় নাই। ধর্মপালের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে বুদ্ধগয়ায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমূর্তিত্রয়ে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূর্তিত্রয় একই প্রস্তরখণ্ডে খোদিত। প্রস্তরখণ্ডের মধ্যভাগে তিনটি স্বতন্ত্র কক্ষে, সূর্য, মহাদেব ও বিষ্ণুর মূর্তি খোদিত

হইয়াছিল। কক্ষত্রয়ের দক্ষিণপার্শ্বে যে লেখা আছে তাহা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ধর্মপালদিগের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতিথিতে শনিবারে উজ্জ্বল নামক ভাস্করের পুত্র কেশব কর্তৃক একটি চতুর্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে প্রস্তরখণ্ডে শিলালেখ ও মূর্তি তিনটি আছে তাহা কিন্তু চতুর্মুখ মহাদেবের মূর্তি নহে। সম্ভবত যে মন্দিরে চতুর্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এই প্রস্তরখণ্ড তাহার দুয়ারের এক অংশ। এই প্রস্তরখণ্ডে যে তিনটি মূর্তি খোদিত আছে তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, শিল্পের অবস্থা বা ভাস্করের আদর্শ খ্রিস্টাব্দের অষ্টম শতকের প্রথম ভাগ হইতে শেষভাগে বিশেষ উন্নত হয় নাই। এই শিলাখণ্ডে অঙ্কিত তিনটি মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা কেশব একজন ভাস্করের পুত্র এবং তাহার আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না কারণ এই শিলালেখ হইতেই জানিতে পারা গিয়াছে যে, তিনি তিন হাজার দ্রম্ম বা রজতমুদ্রা ব্যয় করিয়া বুদ্ধগয়ায় একটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এই সময়ের আর একটি মূর্তি বিহারে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাও বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিটি ও সেনাপতি মল্লুকের মূর্তি এবং বুদ্ধগয়ার মুচলিন্দ রক্ষিত বুদ্ধমূর্তিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। মুল্লুকের প্রতিষ্ঠিত মূর্তি ও বুদ্ধগয়ার মুচলিন্দ রক্ষিত বুদ্ধমূর্তিতে যতটা পরিমাণে ভাস্করের অনুপাত জ্ঞানের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে তাহা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সৌন্দর্যের আদর্শের পরিমাণ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ধর্মপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি খ্রিস্টাব্দের নবম শতকের প্রথম পাদেও জীবিত ছিলেন। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবপালের প্রায় ৪০ বৎসর ব্যাপী রাজ্যকালে গৌড়ীয় শিল্পের অকস্মাৎ প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এই উন্নতি পালবংশের প্রথম সাম্রাজ্য নষ্ট হইলেও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। উন্নতি লাভ করিয়া গৌড়ীয় শিল্প যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিল তাহা পূর্বে ও পরে ভারতবর্ষের অপর কোনও প্রাদেশিক শিল্প অলম্বন করে নাই। এই উন্নতি প্রকৃতপক্ষে ভারতে একটি নূতন শিল্পরীতির উৎপত্তি। পূর্বে যেমন মথুরায়, মহারাষ্ট্র দেশে ও অন্ধ্রদেশে নূতন শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিল্পায়তনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই সকল শিল্পায়তনের নিদর্শন লোকে বহু দূর দেশে লইয়া যাইত, নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে জাত গৌড়ীয় শিল্পরীতি তেমনি নূতন শিল্পায়তনে পরিণত হইয়া দেশে বিদেশে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গান্ধারের ভাস্করের শিল্প-নিদর্শন যেমন খোটানের মরুভূমি হইতে মথুরা পর্যন্ত সর্বত্র আদর পাইয়াছিল, মথুরার শিল্পীর রক্তপ্রস্তর গঠিত মূর্তি যেমন পূর্বে বুদ্ধগয়া দক্ষিণে সাঁচি ও পশ্চিমে মহেন-জো-দারো পর্যন্ত লোকে লইয়া যাইত, বারাণসীর গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি যেমন বরেন্দ্রভূমি বাঙ্গালী নিজের দেশে লইয়া আসিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিত সেইরূপ গৌড়ীয় ভাস্করের মূর্তি খ্রিস্টাব্দের নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিমে শ্রাবন্তী দক্ষিণে পুরী বা পুরুষোত্তম্ পূর্বে ব্রহ্ম, শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপ এবং উত্তরে তিব্বত পর্যন্ত সাদরে গৃহীত হইত। গৌড়ীয় শিল্পের এই বিস্তারের কাহিনি এখনও লিখিত হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার কথা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে সমস্ত

দেশে গৌড়ীয় শিল্পরীতির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চারিশত বৎসর ধরিয়া গৌড়ের শিল্প গান্ধার ও মথুরায় শিল্পায়তনের ন্যায় সুদূরবিশ্রুত একটি নূতন শিল্পায়তনে পরিণত হইয়াছিল।

এই চারিশত বৎসর গৌড়ীয় শিল্পরীতি সমানভাবে চলে নাই, কখনও বা ইহার উন্নতি হইয়াছে এবং কখনও বা উন্নতির পরিবর্তে অবনতি দেখা গিয়াছে। এই প্রবন্ধের সহিত যে-সকল মূর্তির চিত্র মুদ্রিত হইল তাহার সমস্তগুলিই গৌড়ীয় ভাস্করের শিল্পের নিদর্শন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গৌড়ীয় শিল্পের কীরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্যই গৌড়ীয় শিল্পেতিহাসের তিনটি যুগের নিদর্শন একত্র সন্নিবিষ্ট হইল। উপাসক ও বলহিকের বজ্রপাণি ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত গুণমনির তারা-মূর্তি মগধে আবিষ্কৃত। এই দুইটি যে যুগের মূর্তি মৈত্রেয় মূর্তিটিও সেই যুগের,কিন্তু লেখবিহীন বুদ্ধমূর্তিটি তাহার কিছু পূর্বের, সম্ভবত গোপাল অথবা ধর্মপালের রাজত্বকালের। নালন্দায় আবিষ্কৃত নারায়ণের বরাহ অবতারের মূর্তি ও বিক্রমপুরে আবিষ্কৃত নরসিংহের মূর্তি আর এক যুগের শিল্প নিদর্শন, এই দুইটি মূর্তি গৌড়রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের খোদিত হইলেও ইহারা একই রীতি অবলম্বনে এবং এক জাতীয় আদর্শের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। নাগরাজ মুচলিন্দ রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি দুইটি দেখান হইয়াছে; ইহার মধ্যে লেখযুক্ত মূর্তিটি গৌড়ীয় শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তীযুগের এবং লেখবিহীন মূর্তিটি পরবর্তী যুগের শিল্প নিদর্শন। উত্তরবঙ্গে রাজশাহি জেলায় গোদাগাড়ি গ্রামের নিকটে প্রদ্যুম্নর বা পদুম শহর নামক বিখ্যাত দীর্ঘিকায় আবিষ্কৃত এবং অধুনা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি এবং নালন্দার চতুষ্পার্শ্বের কোনও স্থানে আবিষ্কৃত খদিরবনিতারার মূর্তি গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসে অপর এক যুগের নিদর্শন। এই তিন যুগের শিল্প নিদর্শন দেখিয়া যাহারা শিল্পেতিহাসের আলোচনা করেন না তাহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে দ্বাদশের শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসে বহু উত্থান, পতন ও পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। শিলালেখের অক্ষরের বিবর্তন অবলম্বন করিয়া লেখযুক্ত মূর্তির সাহায্যে এই তিনটি যুগের শিল্পাদর্শের উন্নতি বা অবনতি মুদ্রিত গ্রন্থের ন্যায় স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে।

[সম্পাদকীয় সংযোজন : এই প্রবন্ধটি সংগ্রহে আমরা শ্রীপ্রকাশ দাস বিশ্বাসের কাছে ঋণী। লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে যে সমস্ত ছবিগুলির কথা আলোচনা করেছেন সেই ছবিগুলির কিছু আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি এবং কিছু ছবি এমনই খারাপ অবস্থায় রয়েছে যে সেগুলি অলঙ্করণে ব্যবহার উপযোগীতা হারিয়েছে। সঙ্গের ছবিগুলি উদ্ভাস সম্পাদকমণ্ডলীর নিজস্ব সিদ্ধান্তেই দেওয়া হয়েছে।]
চিত্র পরিচিতি : ১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্লভ চিত্র; ২। পালযুগের পাথরের নর্তকী ; ৩। পালযুগের পাথরের বিষ্ণুমূর্তি; ৪। লক্ষ্মণসেনের আমলে তৈরি পোড়ামাটির ভাস্কর্য।

পুনপ্রকাশ: প্রবাসী, (মাঘ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) সংখ্যা থেকে। শব্দ গঠন ও বাক্য রচনায় আধুনিক রীতি অনুসরণ করলেও লেখাটিতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বানান মেনে চলা হয়েছে।